উল্লিখিত হয়েছেন করছুগ্‌মা বা করফাগ্‌মা বলে। তিনি লেখটিতে 'কোডিহালিক' বলে আখ্যাত (মুখার্জী ১৯৯০: ৪৬)। 'কোডিহালিক' শব্দটি সম্ভবত এমন এক ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে যিনি কোটি (= অর্থাৎ অসংখ্য) হালের মালিক, অথবা যিনি বহু'হালিক' বা কৃষকের নিয়োগকর্তা। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, করছুগ্‌মা বা করফাগ্‌মাকে প্রচুর ভূসম্পদের মালিক বলে মনে হয়। লাঙ্গলভিত্তিক কৃষিকর্ম যে বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেই দিকেও আলোচ্য নামমুদ্রাটি ইঙ্গিত দেয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাদিপুর থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি ছাইরঙা ছোট কলস। তার গলার কাছে খরোষ্ঠী লেখ দেখা যায়। লেখটির পাঠ নিম্নরূপ 'বপায় কোষঃ'—অর্থাৎ বপনযোগ্য বীজ রাখার কোষ বা আধার (মুখার্জী ১৯৯০: ৪৪)। কৃষি যে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ রূপ নিয়েছিল, তার আরও একটি সাক্ষ্য পাওয়া যাবে হাদিপুর থেকে আবিষ্কৃত আ. খ্রি. তৃতীয় শতকের একটি লেখ সংবলিত পোড়ামাটির নামমুদ্রা বা সীলমোহরে। নামমুদ্রায় দেখা যায় শিরোভূষণে সজ্জিত, 'চিটন' জাতীয় রোমান পোশাক পরিহিত এক নারীমূর্তিকে; তাঁর বাম হাত কোমরের কাছে; ডান হাতে তিনি ধরে আছেন সশীষ ধান্য। তাঁর ডান দিকে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে ভক্ত বলে মনে হয়। অতএব , নামমুদ্রায় প্রদর্শিত নারীমূর্তি কোনও দেবীর মূর্তি। ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী লেখটিতে দেবী 'ধান্যজী' বলে অভিহিত; অর্থাৎ ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (মুখার্জী ১৯৯০: ৫৯-৬০)। প্রায় একই রকম আরও একটি গোলাকৃতি পোড়ামাটির সীলমোহরের দিকে নজর দেওয়া যাক। চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রিত হরফে উৎকীর্ণ সীলমোহরটির কাল নির্দেশ করা হয়েছে খ্রি. তৃতীয় শতকে। এখানে দেখা যাবে আর একটি দেবীমূর্তি; দেবীর মস্তকে বৃহৎ ভূষণ; ডান হাত কোমরে রেখে তিনি দণ্ডায়মান। লেখ অনুসারে নারীমূর্তিটি 'যক্ষী জিরাম্বী' বলে আখ্যাত। ইনি অবশ্যই এক প্রকার মাতৃকা, এবং সম্ভবত জিরা-র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কৃষির সাফল্যই প্রাচীন বাংলায় নানাবিধ ফসলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরাধনার পথ করে দেয় (মুখার্জী ১৯৯০: ৫৫-৫৬)।

সমগ্র উপমহাদেশে লাঙ্গল ভিত্তিক কৃষির প্রচলন অর্থনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বদল এনেছিল। কিন্তু খ্রি.পূ. ২০০ থেকে খ্রি. ৩০০ পর্যন্ত সময়সীমায় সবচেয়ে চমকপ্রদ অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা যাবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত দূরপাল্লার বাণিজ্যে। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের বাণিজ্য প্রথমে পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত প্রসারিত হলেও, পরবর্তীকালে—বিশেষত খ্রি.পূ. প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে—দক্ষিণ এশিয়া এক বিশাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সক্রিয় শরিক হয়ে যায়। এ কথা ঠিকই, ভারতের পরিপ্রেক্ষিত থেকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রধানত আলোচিত হয়েছে সাহিত্যগত তথ্যসূত্রের উপর ভিত্তি করে। এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা আগে করা হয়েছিল পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী, প্লিনির ন্যাচুরালিস ইস্তোরিয়া (ন্যাচারাল হিস্ট্রি) এবং টলেমির জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস

Scanned with CamScanner

ধরে; তার সঙ্গে তামিল সঙ্গম সাহিত্যের বর্ণনাও সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত দুই দশকে সাহিত্যগত সাক্ষ্যের পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে নানাবিধ পুরাবস্তু, যা ভারতের দূরপাল্লার বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি বুঝতে বিশেষ সহায়ক। সাহিত্যগত তথ্যসূত্রের গুরুত্ব কিছু কমেনি; কিন্তু তাকে পুরাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বাণিজ্যের ছবিটি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরেশিয়া হয়ে যে স্থলপথ ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাকে উনিশ শতকে এক জার্মান পণ্ডিত রেশমপথ (সাইডেনস্ট্রাসে/ সিল্ক রোড) বলে অভিহিত করেন। চীনের রেশমের প্রভূত জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক কদরের কারণেই এমন নামকরণ হয়েছিল। চীনা এবং গ্রিক সাহিত্যগত তথ্য ও পুরাবস্তুর সাক্ষ্য মিলিয়ে পড়লে অনুমান করা যায় যে এই স্থলপথের সূচনা পূর্ব চীনের লৌলান অঞ্চলে। সেখান থেকে আরও পশ্চিমে তুন হুয়াং বা দুন হুয়াং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ চিত্রকলার কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়। এই অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত টাকলা মাকান মরুভূমিকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য ওই ভয়াবহ মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে দুটি পৃথক স্থলবাণিজ্যপথ উদ্ভূত হয়। উত্তরের পথটি গিয়েছিল তুরফান, কুচা, আকসু ছুঁয়ে সু-লে বা বর্তমান কাশগড় পর্যন্ত। দক্ষিণের পথটি শান শান, নিয়া, খোটান, ইয়ারকন্দ হয়ে আসত ওই কাশগড় পর্যন্ত। অর্থাৎ কাশগড় ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দুই পথের সঙ্গমস্থল। কাশগড় থেকে মার্ভ বা মার্জিয়ানা পৌঁছনো যেত তা-ইয়ুয়ান বা ফরগনা এবং সমরকন্দ হয়ে; আবার উত্তরপূর্ব আফগানিস্তানে অবস্থিত ব্যাকট্রা (মজর-ই-শরিফ অঞ্চল) দিয়েও মার্ভে যাওয়া সম্ভব ছিল। এর পর বর্তমান ইরানের মধ্য দিয়ে হেকাটমপুলোস, একবাটানা, পেরিয়ে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস বিধৌত ইরাকের হাটরা এবং পালমিরার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে পথটি শেষ হত। ব্যাকট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি পৃথক পথ কীভাবে কাবুল, পেশোয়ার ও তক্ষশিলা হয়ে উপমহাদেশে প্রবেশ করত, তার কথা পূর্বেই আলোচিত (পৃ. ১৩৬-৩৮)। বিগত দুই দশকে কারাকোরাম সড়কে বহু নতুন পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। বোঝা যায়, রেশম পথের একটি শাখা এখনকার গিলগিট ও চিলাস-এর মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ অনেক কম পথ পেরিয়ে) উপমহাদেশকে যুক্ত করত। এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর খরোষ্ঠী ও পরবর্তী আমলে ব্রাহ্মী লেখ, চীনা ও সোগদীয় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালেখ এবং শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ/অঙ্কিত বিবিধ দৃশ্য। নানাবিধ লিপি ও ভাষার সহাবস্থান সহজেই বুঝিয়ে দেয় গিলগিট ও চিলাসে জড়ো হতেন নানা এলাকার মানুষ। ট্রাউজার, কোট ও কোনাচে টুপি পরিহিত অভারতীয় ব্যক্তিরা বৌদ্ধ স্তূপের সামনে উপাসনারত, এমন দৃশ্য প্রায়ই পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত বা অঙ্কিত। মধ্য এশীয় পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নিয়ে চলেছেন অনেকগুলি ঘোড়া, এমন দৃশ্যও দুর্লভ নয়। ঘোড়ার ছবিও যথেষ্ট। অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে এই পথটি যদিও অত্যন্ত বিপদসংকুল, কিন্তু দূরত্ব কমাবার তাগিদে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এই দুর্গম পথে পাড়ি দিতেন। ঘোড়া আমদানির জন্য এই বাণিজ্যপথটির গুরুত্ব অস্বীকার

Scanned with CamScanner

করা অসম্ভব। প্রাচীন চীনা তথ্যসূত্রের আলোকে এই পথটিকে 'চি-পিন' বা কাশ্মীর পথ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চল খ্রিস্টীয় প্রথম তিন শতক ধরে বোধহয় কুষাণ অধিকারে ছিল। এর ফলে রাজনৈতিক সংহতির মাধ্যমে কাশ্মীরের এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত পথটি উত্তর ভারতীয় স্থলপথগুলির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায় (য়েটমার ১৯৮৯, ১৯৯১; দানি ১৯৮৩, ১৯৮৯; মুখার্জী ১৯৯৬; ফ্রাই ১৯৯৬: ৪৫৬-৬০; ফ্রাই এবং লিটভিনস্কি ১৯৯৬: ৪৬১-৬৪)।

তবে দূরপাল্লার বাণিজ্যের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক ভারত সাগরের সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। এই বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত আলোচনার (১৩৯-১৪৭) সঙ্গে আরও নূতন বক্তব্য সংযোজন করা জরুরি। জলপথে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে যাতায়াত যে অত্যন্ত নিয়মিত হয়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রধান উপাদান মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা। গ্রিক ও ল্যাটিন গ্রন্থে এই বায়ুপ্রবাহ সাধারণত হিপ্পালাস এবং ইটেসিয়ান বায়ু বলে আখ্যাত। বহুপ্রচলিত ধারণা যে হিপ্পালাস নামক এক গ্রিক নাবিক এই বায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করেন, ফলে তাঁর নামেই গ্রিক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ চিহ্নিত হয়ে যায়। ভিন্নভাবে বললে, এই যুক্তিতে এশীয় ও আফ্রিকায় জলরাশিতে বিচরণের প্রথম কৃতিত্ব ইউরোপীয়দেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই ধারণা সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিকই সন্দিহান। গ্রিক ও রোমান বণিকদের ভারত মহাসাগরের চলাচলের পূর্ব থেকেই এই সমুদ্রে পাড়ি দেবার নজির আছে। ফলে মৌসুমী বায়ু আবিষ্কারের কৃতিত্ব নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্যের বণিক ও নাবিকদের উপর আরোপ করার সমস্যা আছে।

প্লিনির গ্রন্থে এই বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে যে বিশদ বর্ণনা দেখা যায়, তাকে অনুপুঙ্খসহ বিচার করে মাজারিনো একটি চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন। প্লিনির বর্ণনায় বায়ুপ্রবাহের নাম হিপ্পালাস নয়, 'হাইপালুম্'। এর সঙ্গে কোনও গ্রিক নাবিকের নাম সম্পৃক্ত নয়, তিনি কোনও বায়ুপ্রবাহও আবিষ্কার করেননি। এডেন অঞ্চল থেকে বিশেষ ঋতুতে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ চলত, তাকেই প্লিনি 'হাইপালুম' বলে অভিহিত করেছিলেন। 'হাইপালুম' সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সমার্থক (মাজারিনো ১৯৯৭)। প্লিনি জানিয়েছিলেন মৌসুমী বায়ু সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর উন্নত হওয়ার ফলে লোহিত সাগরের বন্দর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু অনুসরণ করে মাত্র চল্লিশ দিনে মালাবার উপকূলের বিখ্যাত বন্দর মুজিরিসে পৌঁছনো যেত। সুদূর অতীতের জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতি ও জলযান চালনার কৌশল সম্বন্ধে গভীর গবেষণার পর লায়নেল ক্যাসন জানিয়েছেন, চল্লিশ দিন নয়, মাত্র বিশ দিনেই লোহিত সাগর থেকে ভারতের মালাবার উপকূলে পৌঁছনো সম্ভব ছিল। তাঁর ধারণায় চল্লিশ দিনের হিসেবটি হয় ভ্রান্ত, নয় প্লিনির ন্যাচুরালিস ইস্তোরিয়ার পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরের প্রমাদ বশত লেখা হয়েছিল। ভারত মহাসাগরে সাবেককালের (অর্থাৎ বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের আগে) জলযানের গতিবিধির দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে ক্যাসন আরও একটি ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করেছিলেন। পশ্চিম উপকূলে

Scanned with CamScanner

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দাপটে বর্ষা যখন তুঙ্গে (জুন থেকে অগাস্টের শেষ), তখন দেশি-বিদেশি কোনও জাহাজই সমুদ্রপাড়ি দিত না; আর পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ বন্দরই তখন বন্ধ থাকত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর তীব্রতা হ্রাস পেলে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর নাগাদ, জাহাজগুলি লোহিত সাগর থেকে রওনা হত এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে ভিড়ত। অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের গোড়ায় মৌসুমী বায়ুর দিক পরিবর্তনের ফলে যখন তা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে শুরু করত, তখন জাহাজগুলির পক্ষে পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করা সুবিধাজনক ছিল (ক্যাসন ১৯৮৮; ১৯৯২)।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আলোচনা করতে হবে একটি বিশেষ ধরনের তথ্যসূত্রের, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাসে এমন আকর তথ্যসূত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তথ্যসূত্রটি হল আ. খ্রি. দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে প্রস্তুত একটি ঋণের চুক্তিপত্র; একটি প্যাপিরাসের উপর তা লেখা হয়। বর্তমানে ভিয়েনার একটি সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই অসামান্য দলিলের সম্পাদনা করার জন্য ঐতিহাসিকমহল লায়নেল ক্যাসনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন (ক্যাসন ১৯৯০)। এই ঋণপত্রের বক্তব্য বিষয় এখন বিচার করা যাক। মালাবারের শ্রেষ্ঠ বন্দর মুজিরিসে অপেক্ষমান জাহাজ হার্মোপোলনে তোলা হয়েছিল রফতানিযোগ্য কয়েকটি ভারতীয় পণ্য। এগুলি হল গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার নার্ড (Nard) বা এক প্রকার সুগন্ধী তেল, উত্তম গজদন্ত এবং বহুমূল্য বস্ত্র। প্রতিটি পণ্যই নিঃসন্দেহে বিলাসের সামগ্রী। রোম সাম্রাজ্যের বিত্তবান গোষ্ঠীর কাছে এগুলির যে যথেষ্ট কদর ছিল, অন্যান্য তথ্যসূত্রে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। মোট ছয়টি পেটিকায় এই সামগ্রী রাখা ছিল। প্রত্যেকটির ওজন ও মূল্যের তালিকাও দলিলে লিপিবদ্ধ আছে। তার বিশদ হিসেবের মধ্যে না গিয়েও দেখা যায় যে মোট ১১৫৪ ট্যালেন্ট ও ২৮৫২ দ্রাখমা (রৌপ্যমুদ্রা)-র মূল্যের সামগ্রী জাহাজে তোলা হয়। হার্মোপোলন জাহাজটির গন্তব্যস্থল মুজিরিস থেকে লোহিত সাগরের একটি বন্দরে। বন্দরের নাম পড়া যায় না; কিন্তু খুব সম্ভবত হয় বেরেনিকে অথবা মিওস হর্মোস। লোহিত সাগরের বন্দরটিতে জাহাজ পৌঁছলে পণ্যসামগ্রী নামিয়ে তা নিয়ে যাওয়া হত উটের পিঠে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র কোপ্টস-এ। কোপ্টস থেকে তা আবার তোলা হবে নীলনদের জলযানে। শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছবে মিশরের বিখ্যাত বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া, যা তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন। আলেকজান্দ্রিয়ার সরকারি গুদামখানায় সামগ্রী রাখা থাকবে; এর উপর পঁচিশ শতাংশ আমদানি শুল্ক দিলে ওই সামগ্রী গুদামখানা থেকে বার করে ভূমধ্যসাগরীয় জাহাজে ওঠানো হবে; সেই জাহাজেই সামগ্রীগুলি শেষ পর্যন্ত রোমের বাজারে পৌঁছবে।

এই ঋণের চুক্তিপত্রটিতে মালাবারের বিখ্যাত পণ্য গোলমরিচ নেই; এটি অবশ্যই বিস্ময়কর। গ্রিক এবং ল্যাটিন বিবরণ এবং সঙ্গম সাহিত্যের বর্ণনা প্রায় সমস্বর: দেশি-বিদেশি দুই প্রকার তথ্যসূত্রেই বিশদভাবে বলা হয়েছে মালাবারের গোলমরিচ বহু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জাহাজ ভর্তি করে রোমের বাজারে নিয়ে যাওয়া

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

যাচ্ছে। খ্রি. প্রথম শতকের শেষে পেরিপ্লাস-এর অজ্ঞাতনামা লেখক পূর্বতটের যতগুলি বন্দরের উল্লেখ করেছেন, তার চেয়ে আ. ১৫০ খ্রি.-এ টলেমির ভূগোলে পূর্ব উপকূলস্থ বন্দরের তালিকাটি বড়। টলেমিই প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিত যিনি বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট নামকরণ করলেন: 'দ্য গ্যাঞ্জেটিক গালফ' বা গাঙ্গেয় খাড়ি। সব মিলিয়ে মনে হয় ভারত মহাসাগরের সমুদ্রবাণিজ্যে পূর্বতীরস্থ বন্দরগুলির তাৎপর্য বাড়ছিল। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ মিলবে একটি বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্রের মাধ্যমে। এই মৃৎপাত্র প্রায় সর্বদা থালার আকারবিশিষ্ট; থালার কানা উঁচু; সাধারণত কালো, ধূসর এবং ছাইছাই রঙই দেখা যায়। এই মৃৎপাত্রের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক হল থালার উপর বৃত্তাকার নকশা। পুরাতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'রুলেটিং' পদ্ধতিতে এই নকশা ফুটিয়ে তোলা হত; তাই এর অভিধা দেওয়া হয়েছে 'রুলেটেড ওয়্যার'। এই পাত্র পাওয়া গিয়েছে প্রধানত পূর্ব উপকূলের নিকটস্থ প্রত্নক্ষেত্র থেকে, যদিও তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এলাকাতে কখনও কখনও এই মৃৎপাত্র বা তার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। রুলেটেড ওয়্যার-এর প্রাপ্তিস্থানগুলি লক্ষণীয়। শ্রীলঙ্কার মান্তাই, কান্তারোদাই থেকে শুরু করে অলগণকুলম, উরাইয়ুর, কাবেরীপট্টিনম, বাসবসমুদ্রম (তামিলনাড়ুর অন্তর্গত), আরিকামেডু (পণ্ডিচেরি), কোট্টাপটনম, শালিহুণ্ডম, অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা, কন্টকশাল, কলিঙ্গপটনম (অন্ধ্রপ্রদেশ), মাণিকপটনম, শিশুপালগড় (উড়িষ্যা), তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় (পশ্চিমবঙ্গ) এবং মহাস্থানগড় ও ওয়ারি-বটেশ্বর (বাংলাদেশ)। রুলেটেড ওয়্যার-এর প্রাপ্তিস্থানের এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এই মৃৎপাত্রটির ব্যবহার ছিল সমগ্র পূর্ব উপকূল ধরে—দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা থেকে উত্তরে গাঙ্গেয় বদ্বীপ পর্যন্ত (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সহ)। রুলেটেড ওয়্যার প্রথম আবিষ্কার করেন মর্টিমার হুইলার আরিকামেডুতে উৎখননের সময়। তাঁর ধারণা ছিল এই মৃৎপাত্র খ্রি. প্রথম শতকের পূর্ববর্তী নয়। কিন্তু বিমলা বেগলের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত যে এই মৃৎপাত্রের সঙ্গে রোমক বাণিজ্যের সম্পর্ক নেই এবং এটির প্রাচীনত্ব অধিকতর। বেগলের বিচারে রুলেটেড ওয়্যার-এর ব্যবহার ছিল ২০০ খ্রি.পূ. থেকে খ্রি. ২০০ পর্যন্ত। উত্তর ভারতের কৃষ্ণচিক্কণ মৃৎপাত্রের ব্যাপক প্রসার যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, একইভাবে রুলেটেড ওয়্যার থেকে প্রমাণ করা সম্ভব যে সমগ্র পূর্বতটেই উপকূলাশ্রয়ী বাণিজ্য চলত (বেগলে ১৯৯১)। গোগটে রুলেটেড ওয়্যার-এর মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রুলেটেড ওয়্যার-এর মূল উৎপাদন এলাকা চন্দ্রকেতুগড়-তাম্রলিপ্ত অঞ্চল। এখান থেকেই এই মৃৎপাত্র উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছত (গোগটে ১৯৯৭)।

উপরের আলোচনা থেকে বাংলার উপকূলসহ পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সমস্যা হয় না। নিম্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকা সহ বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্য বিগত দশকে মূর্ত হয়েছে খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী মিশ্র

Scanned with CamScanner

লিপিতে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার হওয়ায়। এই পাঠোদ্ধারের কৃতিত্ব ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর (মুখার্জী, ১৯৯০)। চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। অধিকাংশ সীলমোহরই, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ ও ব্যবহৃত। সীলমোহর বস্তুটিই ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত কয়েকটি সীলমোহরে বিভিন্ন প্রকার জলযানের প্রতিকৃতি দেখা যায়। এগুলি প্রকৃতই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তথ্যসূত্র, সমগ্র ভারতবর্ষে এর সমতুল্য কিছু নেই। সীলমোহরে প্রদর্শিত হয়েছে সাধারণ ডিঙি নৌকা জাতীয় ছোট জলযান। একটি সীলমোহরে যে জলযান দেখা যাচ্ছে, তার মাস্তুলটি ত্রিপদবিশিষ্ট একটি কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। উৎকীর্ণ লেখতে জলযানটি 'ত্রপগ' বলে অভিহিত। 'ত্রপ্পগ' নামক তটীয় এলাকায় চলাচলকারী জলযান ব্যবহার হতে দেখেছিলেন পেরিপ্লাস-এর লেখক বারুগাজা বন্দরে। ত্রপ্যাগ বা ত্রপ্পগ নামক জলযান কেমন ছিল দেখতে, তা জানা গেল চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহরটি থেকে। এটাও বোঝা যায় যে এইপ্রকার জলযান গুজরাট উপকূলের মতোই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকাতেও সক্রিয় ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহরে যে 'ত্রপ্যাগ' জাহাজটি প্রদর্শিত, তার উপরে দেখানো হয়েছে একটি দণ্ডায়মান ঘোড়া। কোনও ভারতীয় বন্দর থেকে জলপথে ঘোড়া পরিবহনের এটিই প্রাচীনতম নিদর্শন। এই ঘোড়া সম্ভবত বাংলায় আমদানি করা হত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে; আমদানি করা ঘোড়ার কয়েকটি আবার জলপথে রফতানি করা হত। চীনা ও তামিল সাহিত্যিক তথ্যপঞ্জির উপর ভিত্তি করে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা যে এই ঘোড়া জলপথে বাংলার উপকূল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও করমণ্ডল উপকূলে পৌঁছত। আরও এক প্রকার জলযান সীলমোহরে প্রদর্শিত; উৎকীর্ণ লেখ অনুসারে এটির অভিধা 'জলধিশক্র'। অর্থাৎ সমুদ্রে ইন্দ্রতুল্য। 'ত্রিদেশ যাত্রা' অভিধাটি আরও একটি জলযানের প্রতিকৃতিতে ব্যবহৃত। 'ত্রিদেশযাত্রা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ তিন এলাকা বা তিন দিকে যাত্রা করতে যে জলযান সক্ষম। কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ, সম্ভবত যে জলযান মাঝদরিয়া পেরিয়ে দূর দেশে পাড়ি দিতে পারত। জলধিশক্রও বোধহয় এমনই এক সমুদ্রগামী জাহাজ যা উপকূলে চলাচলকারী 'ত্রপ্যাগ' জাতীয় জলযান থেকে পৃথক। জাহাজগুলি প্রায় সবক্ষেত্রে একমাস্তুলবিশিষ্ট। এক বা একাধিক দাঁড়ও প্রতিকৃতিগুলিতে উপস্থিত। অন্তত একটি জলযানের ক্ষেত্রে হালচালনার উপকরণও দেখানো হয়েছিল। বহুক্ষেত্রেই জাহাজের পাটাতনের উপর রাখা একটি পেটিকা দেখা যায়; পেটিকা থেকে উদ্গত ধানের শীষ নজর এড়ায় না। কখনও ধানের শীষ পৃথকভাবে সীলমোহরের ডান দিকে বা বাঁদিকেও প্রদর্শিত হয়েছে। অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে বাংলা থেকে জলপথে রফতানি হত ধান। সমুদ্রবাণিজ্যে ধানও যে এত প্রাচীন কালে একটি পণ্য ছিল, চন্দ্রকেতুগড়ের সীলমোহর তার জোরালো প্রমাণ নিয়ে হাজির (মুখার্জী ১৯৯০; চক্রবর্তী ১৯৯৬, ২০০০)।

Scanned with CamScanner

কিছুটা ভিন্ন আকৃতির জলযান দেখা যাবে এক বিশেষ ধরনের সাতবাহন মুদ্রায়। এই মুদ্রাগুলি কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে এবং পূর্ব উপকূলেই প্রচলিত ছিল বলে মুদ্রাতাত্ত্বিকরা মনে করেন। সাতবাহন মুদ্রায় উৎকীর্ণ জাহাজে দুটি মাস্তুল দেখা যায়। আর একটি মুদ্রায় প্রদর্শিত হয়েছে অনেকগুলি জলযান। অন্ধ্র উপকূলে যে সমুদ্রবাণিজ্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল, তার অবিসংবাদী প্রমাণ এই মুদ্রাগুলি বহন করছে। অন্ধ্র উপকূলেই অবস্থিত কণ্টকসোল বা ঘণ্টশাল বন্দর, যা টলেমির ভূগোলে কোণ্টাকসুল্লা বলে অভিহিত। খ্রি. প্রথম শতকের একটি লেখ থেকে জানা যায় ঘণ্টশালের এক মহানাবিকের কথা। তিনি জাহাজ চালনায় দক্ষ প্রবীণ নাবিক হতে পারেন, আবার 'মহানৌ' বা বৃহৎ সমুদ্রগামী জলযানের চালক হিসেবেও 'মহানাবিক' বলে আখ্যাত হতে পারেন (ঘোষ, ২০০১)।

ভারতের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যসম্পর্ক নিয়ে গবেষণার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। নূতন নূতন পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও লিখিত তথ্যসূত্রের নতুন পর্যালোচনা এই ইতিহাসচর্চাকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ১৯২৮ সালে ওয়ার্মিংটন যখন তাঁর প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে এই দূরপাল্লার বাণিজ্যে যাবতীয় উদ্যোগ ও উদ্যম এসেছিল পাশ্চাত্যের বণিক ও নাবিকদের তরফ থেকে। কারণ তাঁর বিচারে ভারতীয়রা একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর এবং বাণিজ্যবিমুখ; শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা তাদের সমুদ্রযাত্রার প্রতি সুদীর্ঘ অনীহার জন্ম দিয়েছিল (ওয়ার্মিংটন ১৯২৮ : ১)। একথা ঠিকই ভারতীয়দের দূরদূরান্তরে যাত্রা—তা সে স্থলপথে বা জলপথে যেভাবেই হোক—সম্বন্ধে খুব বেশিসংখ্যক প্রমাণ নেই। তবে এই বিষয়ে সাম্প্রতিক নতুন তথ্য জানা গিয়েছে। লোহিত সাগরীয় এলাকা থেকে খ্রি. প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি মৃৎপাত্রের টুকরোর উপর তামিল ভাষায় ও ব্রাহ্মী লিপিতে চট্টন বলে এক ব্যক্তির নাম দেখা যায়। মিশর থেকে পাওয়া গিয়েছে আ. খ্রি. দ্বিতীয় শতকের আরও একটি লেখ। তাতে উল্লিখিত হয়েছেন নাগদত্ত, বিষ্ণুপালিত নামক দুই ভারতীয় ব্যক্তি। এঁরা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে লোহিত সাগরীয় এলাকা ও মিশর পর্যন্ত যাতায়াত করলে অবাক হবার নেই (সলোমন, ১৯৯১)। একথাও ভুললে চলবে না যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উৎপন্ন নানাবিধ সুগন্ধী, মশলা ও দুর্মূল্য রত্ন রোমের বাজারে পৌঁছত ভারতীয় বন্দরগুলি মারফত। পশ্চিমের ব্যবসায়ীরা সরাসরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপাড়ি দিতেন কি না, সন্দেহ আছে। ফলে অনুমান করে যায় যে বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় যে সমুদ্র বাণিজ্য চলত, তাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও ভারতের বণিকরা অংশ নিতেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির উপস্থিতি এই বাণিজ্যিক যোগাযোগেরই ফল (গ্লোভার, ১৯৯৬; রায় ১৯৯৫, চক্রবর্তী ২০০১)। বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যে প্রাচীন বাংলাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়, তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে বাংলায় খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহারের মধ্যে। ১৯৮৯-৯০ এর আগে পর্যন্ত এই ধারণাই ছিল যে খরোষ্ঠী মূলত উত্তর পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকাতে

বহুল প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গে খরোষ্ঠী (কখনও কখনও ব্রাহ্মী-র সঙ্গে মিশ্রিতভাবেও ব্যবহৃত)-র ব্যবহার থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই লিপি গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় এল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে। উত্তরপ্রদেশের চূনার থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রস্তরস্তম্ভ; তার উপর খ্রি. প্রথম-দ্বিতীয় শতকের খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ লেখ পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহারকারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ গাঙ্গেয় বদ্বীপে এসেছিলেন মধ্যগঙ্গা উপত্যকা পেরিয়ে—এই ছবিটি এখন অনেকটাই উজ্জ্বল (মুখার্জী ১৯৯০)।

এই যোগাযোগের একটি রাজনৈতিক মাত্রাও সম্প্রতি আমাদের গোচরে এসেছে। আফগানিস্তানের রবাতক থেকে পাওয়া কনিষ্কের একটি নূতন লেখ (ব্যাকট্রীয় ভাষায় রচিত) থেকে জানা যায় যে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সাগিদো (= সাকেত, অর্থাৎ বর্তমান অযোধ্যা অঞ্চল), কোসোম্বো (=কৌশাম্বী, এলাহাবাদের নিকটস্থ), পালিবোথ্রো (পাটলিপুত্র) এবং শ্রোশোম্পো (= শ্রীচম্পা বা পূর্ব বিহারের ভাগলপুর)। কনিষ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা বিহারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যা কার্যত প্রাচীন বাংলার লাগোয়া এলাকা। (সিমস-উইলিয়ামস এবং ক্রিব ১৯৯৬; মুখার্জী ১৯৯৮; রায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী এবং মণি ২০০০ : ৫৯৭-৬০১)। কুষাণদের রাজনৈতিক ক্ষমতা মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বতম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বভারতে খরোষ্ঠী লিপি ছড়িয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

বাণিজ্যের এই চমকপ্রদ বিস্তার নগরায়ণকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করেছিল। নগরায়ণের সর্ব ভারতীয় বিস্তার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় অগ্রগতির ফলে নগরায়ণের ব্যাপকতা অনুধাবন করা সহজতর হয়েছে (চক্রবর্তী ১৯৯৫; অলচিন ১৯৯৫)। কোনও সন্দেহ নেই আদি ঐতিহাসিক পর্বের নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল তামিলভাষী অঞ্চলে নগরজীবনের প্রসার। নগরগুলির দেখা পাওয়া যাবে সঙ্গম সাহিত্যে বর্ণিত মরুদম্ তিনাই (উর্বর কৃষিপ্রধান নদী উপত্যকায়) এবং নেইদাল তিনাইতে (উপকূলবর্তী এবং বদ্বীপ এলাকায়)। খ্রি. পূ. প্রথম শতকের আগে দ্রাবিড় দেশে এতগুলি নগরের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ছিল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তামিলনাড়ুর ত্রিচিনোপল্লী জেলায় ছিল কারুর, যার পরিচয় বাণিজ্যের প্রসঙ্গে আগে বলা হয়েছে। এটি চেরদের রাজধানী; বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তার খ্যাতি বহু রোমক মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু দ্বারা প্রমাণিত; এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কেন্দ্র হিসেবেও তার পরিচিতি নগণ্য নয়। ইরোড জেলার অন্তর্গত কোডুমানাল প্রত্নক্ষেত্রটিকে শনাক্ত করা হয়েছে সঙ্গম সাহিত্যে বর্ণিত পর্তিরুপ্পাট্টুর সঙ্গে। এই স্থানটি থেকে মাত্র ছয় কি. মি. দূরে পাওয়া যেত পডিয়ুর-এর বৈদূর্য। উৎখনন থেকে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে নানাবিধ রত্নরাজির। স্বর্ণালঙ্কারগুলি ২৪ ক্যারাট সোনা দিয়ে তৈরি; রূপার তৈরি আংটিও পাওয়া গিয়েছে কোডুমানালে। কোডুমানাল যে দামি ধাতু ও রত্নের লেনদেনের জন্য

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বুঝতে পারা যায়। কোডুমানাল থেকে পাওয়া একটি মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষে 'নিগম' শব্দটি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 'নিগম' শব্দটি সাধারণত কোনও বণিক সংগঠনকে বোঝায়। কোডুমানালের বসতির কাছেই ছিল সমাধিক্ষেত্র। একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এই বসতিটি কীভাবে নগরসুলভ আকার ও চরিত্র লাভ করেছিল, পুরাতাত্ত্বিক উপাদান তার সাক্ষ্য বহন করে।

সঙ্গম সাহিত্যে যে নগর সালিউর নামে আখ্যাত, তার পুরাতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে বৈগাই নদীর মোহানায় অবস্থিত এবং রামনাথপুর জেলার অন্তর্গত অলগনকুলম প্রত্নক্ষেত্রে। সঙ্গম সাহিত্যে বলা হয়েছে এটি ছিল 'মারুঙ্গুর' বা উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর নগর। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র, উত্তর ভারতের কৃষ্ণচিক্কন মৃৎপাত্র, রুলেটেড পাত্র, পানীয় সংরক্ষণের অ্যামফোরা এবং রৌপ্য মুদ্রা। অপর একটি নগর হল উরাইয়ুর, তার অবস্থান ত্রিচিনোপল্লী জেলায়। সঙ্গম সাহিত্য অনুসারে এই নগরটির সুরক্ষাব্যবস্থা ছিল উচ্চমানের; নগরের বাইরে ছিল সমাধিক্ষেত্র। উৎখনন থেকেও সমাধিক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। উরাইয়ুর এর প্রথম সাংস্কৃতিক স্তর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র, রুলেটেড পাত্র, ইটালির অ্যারেটাইন পাত্র এবং ব্রাহ্মী লেখ। দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক পর্ব থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কাপড় রং করার চৌবাচ্চা। নগরটি সম্ভবত বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল। সঙ্গম সাহিত্যের অন্তর্গত মাদুরাইক্কাঞ্চী কাব্য মধুরা/মাদুরাই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; এটি পাণ্ড্যদের শক্তিকেন্দ্রও বটে। সাহিত্যগত বর্ণনা অনুসারে দূর দূর দেশ থেকে বণিকরা এই নগরে আসতেন; নগরের বাজার এলাকার বিশদ বর্ণনাও মাদুরাইক্কাঞ্চী কাব্যে উপস্থিত। প্রাণবন্ত বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায়। কাবেরীপট্টিনম-এর প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত; কিন্তু আরও দু একটি বাড়তি কথা এখানে যোগ করা যেতে পারে। তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত কাবেরীপট্টিনম সঙ্গম সাহিত্যে 'পেরুর' এবং 'মানগর' অর্থাৎ বৃহৎ নগর বলে প্রসিদ্ধ। নগরটি যে সত্যিই বৃহদায়তন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পুরাতত্ত্বে। পুহার-এর উৎখনন থেকে দেখা যায়, এই নগরের অবশেষ ছড়িয়ে আছে পুহার-এর আশপাশের অন্তত চল্লিশটি প্রত্নস্থলে। পড্ডিনাপ্পালাই, শিলাপ্পাদিকারম ও মণিমেখলাই-এর বর্ণনা অনুযায়ী নগরটির দুটিভাগ : পড্ডিনাপ্পাক্কম বা মূল বসতি এলাকা এবং মরুবুরপ্পাক্কম বা বন্দর এলাকা। এই নগরে 'মণিগ্রামম্' নামক তামিল বণিক সংঘের সক্রিয় উপস্থিতির বর্ণনাও পাওয়া যাবে তামিল সাহিত্যে। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে যে পুহারে বৌদ্ধ বিহার ছিল তার নির্ভরযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে।

তামিলনাড়ুর চিংলিপুট জেলায় অবস্থিত কাঞ্চীপুরম সপ্তম শতক থেকে পল্লবদের রাজধানী হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু সঙ্গম সাহিত্যেও এই নগর কাচ্চী নামে উপস্থিত। উৎখননের ফলে প্রথম সাংস্কৃতিক স্তরের সূচনাপর্বে (খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রি: তৃতীয় শতক) কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র, কালো পালিশযুক্ত পাত্র, রুলেটেড পাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এর পরবর্তী পর্বে (খ্রি. চতুর্থ থেকে

Scanned with CamScanner

নবম শতাব্দী) আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে অ্যারেটাইন পাত্র ও লৌহ উপকরণ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে এই নগরের সঙ্গে বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হত নিরপ্পেয়রু-র বন্দর এলাকায়। এই বন্দরটি বেগবতী নদীর উপর অবস্থিত ছিল। সঙ্গম সাহিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় এই বন্দরে বাতিঘরের সুবিধা ছিল। সেখানে পরতবর বা মৎস্যজীবীদের বাস, আবার প্রশস্ত রাস্তা এবং বণিকদের সুউচ্চ অট্টালিকাও বন্দরটিতে ছিল বলে সঙ্গম সাহিত্য বিবরণ দেয়। কাঞ্চীপুরম-এ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অবশেষও পাওয়া গিয়েছে। কাঞ্চীপুরমের অনতিদূরে ছিল মামল্লপুরম। মামল্লপুরম থেকে ১৩ কি.মি. দক্ষিণে গেলে দেখা যাবে বাসবসমুদ্রম নামক প্রত্নক্ষেত্র। উৎখনন চালিয়ে এখান থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে পানীয় রাখার অ্যামফোরা, রুলেটেড পাত্র, জল নিকাশের জন্য ভূগর্ভে প্রোথিত পোড়ামাটির কলসীসদৃশ 'রিং-ওয়েল', প্রচুর মাল্যদানা, ইটের তৈরি ইমারত (চম্পকলক্ষ্মী ১৯৯৬; চক্রবর্তী ১৯৯৫; ঘোষ, ১৯৮৯)।

সুদূর দক্ষিণ ভারতেও যে নগরায়ণের দ্রুত বিস্তার ঘটছিল, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি অনেকটাই গাঙ্গেয় উপত্যকার আদলে। চম্পকলক্ষ্মীর ধারণা যে তামিল এলাকায় নগরজীবন দেখা দিলেও তা মূলত বহিরাগত উপাদানের দ্বারাই চালিত হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতে দ্বিতীয় নগরায়ণের প্রাণকেন্দ্র গাঙ্গেয় অববাহিকা, সেখান থেকে দক্ষিণ ভারত সহ ভারতের নানা প্রান্তে নগরসুলভ বসতি ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই পরবর্তী নগরগুলিকে দ্বিতীয় দফার নগরায়ণের ('সেকেন্ডারি আর্বানাইজেশন') দ্যোতক বলে মনে করা হয়। নগরায়ণের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই জাতীয় দ্বিতীয় দফার নগরায়ণে বহির্বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দক্ষিণ ভারতে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য এক্ষেত্রে তাই বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। নগরায়ণের ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এল দক্ষিণ ভারতে, তা অনেকাংশেই বহিরাগত উপাদানের অভিঘাতের দরুন ঘটেছিল। দূরপাল্লার বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দক্ষিণ ভারতের নগরায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ফলে এই বাণিজ্যের সংকোচন নগরজীবনের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায় (চম্পকলক্ষ্মী ১৯৯৬)। অন্যভাবে বলতে গেলে দূরপাল্লার সমুদ্রবাণিজ্য দক্ষিণ ভারতে নগরায়ণ সহ উল্লেখযোগ্য বদল আনলেও সেই পরিবর্তন না হল দীর্ঘস্থায়ী, না হল সমাজজীবনে গভীরভাবে প্রোথিত।

Scanned with CamScanner

তাঁর নাম পো-শিআও। পো-শিআও সম্ভবত বাসুদেব নামটির চৈনিক রূপান্তর। হলে, দ্বিতীয় বাসুদেব সম্ভবত ২৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ক্ষমতায় এসেছিলেন; মথুরার উপর তাঁর অধিকার নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। ইনিই সম্ভবত শেষ কুষাণ শাসক।

কুষাণ শাসনের অবসান ঘটে প্রধানত ইরানের সাসানীয় শক্তির উত্থানের ফলে। কুষাণদের সঙ্গে ইরানীয় শাসকদের বৈরিতার দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের অজানা নয়—সাসানীয়দের পূর্ববর্তী আর্সাকীয় বা পার্থীয় সম্রাটদের সঙ্গে কুষাণদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত একেবারে কুজুল কদফিসেস-এর আমল থেকেই। নকশ্-ই-রুস্তম (২৬২ খ্রিস্টাব্দ) লেখ থেকে বোঝা যায় সাসানীয় সম্রাট প্রথম শাহপুর কুষাণশহর বা কুষাণ রাজ্য জয় করেছিলেন। নকশ-ই-রুস্তম লেখ-র আলোকে এও প্রতীয়মান যে অন্তিম লগ্নেও কুষাণদের ক্ষমতা পুশক্‌বুর (পেশাওয়ার) ও সন্নিহিত এলাকা, কাশগড়, সোগদিয়ানা এবং শাশাস্তান বা তাশখন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত মথুরার উপর কুষাণ অধিকারও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম শাহপুর ও তাঁর পিতা প্রথম আর্দাশিরের আক্রমণে কুষাণরা তাঁদের ক্ষমতার প্রধান উৎস ব্যাক্‌ট্রিয়ার উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন। ব্যাক্‌ট্রিয়া হাতছাড়া হওয়ার পর কুষাণদের পতন দ্রুত ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কুষাণশক্তির প্রতিষ্ঠা, উত্থান এবং অবসান—তিনটি প্রক্রিয়াতেই ব্যাক্‌ট্রিয়ার গুরুত্ব সর্বাধিক। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ গবেষণা এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করে। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, অনন্ত সদাশিব অল্টেকার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর (যেমন যৌধেয়, মালব, আর্জুনায়ন প্রভৃতি) প্রবল প্রতিরোধে কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ব্যাক্‌ট্রিয়া হস্তচ্যুত হওয়াতেই কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত আলগা হয়ে যায়। অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি ও কিছু ভারতীয় শক্তি যখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা দিল, ততদিনে কুষাণ সাম্রাজ্য নিতান্ত মুমূর্ষু এক শক্তি মাত্র।

কলিঙ্গরাজ খারবেল

। ৪ ।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় এতাবৎ উত্তর ভারতই ঐতিহাসিকদের মুখ্য মনোযোগের বিষয় ছিল। বৈদিক সাহিত্যে, মহাজনপদের সময়ে এবং মৌর্য আমলে বিন্ধ্যের দক্ষিণে রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সামান্যই অবগত হওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টতর হতে থাকে। কলিঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং সুদূর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় উপস্থিতি নজরে আসে।

Scanned with CamScanner

মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে কলিঙ্গ ছিল একটি *অবিজিত* এলাকা; অন্তত অশোক তাঁর ত্রয়োদশ গিরিশাসনে কলিঙ্গকে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে কলিঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিখুঁতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে কলিঙ্গতে যে কালক্রমে মহামেঘবাহন তথা চেদী বংশ একটি ক্ষমতাবান রাজবংশ হিসেবে উঠে এল, তার পরিচয় বিধৃত আছে কলিঙ্গের প্রথম প্রতাপশালী শাসক খারবেল-এর হাতিগুম্ফা *প্রশস্তিতে*। প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই প্রশস্তিতে খারবেলের রাজত্বের প্রায় সালওয়ারি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু যে বিষয়টি প্রথমেই আলোচনা করা উচিত, তা হল খারবেলের সম্ভাব্য কাল। খারবেল তাঁর পঞ্চম রাজ্যবর্ষে *তি বস শত* পূর্বে নন্দ রাজা কর্তৃক নির্মিত একটি সেচখাল (*পনাডি* = প্রণালী) সংস্কার ও তাকে দীর্ঘায়িত করেছিলেন। *তি বস শত* কথাটিকে কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল ১০৩ বছর (৩ + ১০০) অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী নন্দ রাজার একশ তিন বছর পর কলিঙ্গে খারবেল ক্ষমতাসীন হন। নন্দ শাসনের অন্তিম সময় খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪। তার একশ তিন বছর পর যদি খারবেল রাজত্ব করেন, তবে তাঁর শাসনের সূচনা ৩২৪ – ১০৩, অর্থাৎ আনুমানিক ২২৩ খ্রিস্টপূর্বে স্থাপন করতে হয়। ভিন্নভাবে বললে, জয়সোয়াল অনুমান করেছিলেন অশোকের মৃত্যুর (খ্রিস্টপূর্ব ২৩২) এক দশক পরই কলিঙ্গ মৌর্য আধিপত্য অস্বীকার করে খারবেলের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক *তি বস শত* কথাটিকে ত্রিশতবর্ষ (৩ × ১০০) হিসেবে গ্রহণ করেন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মানলে খারবেলের রাজত্বকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করতে হয় (৩২৪ – ৩০০ = খ্রিস্টপূর্ব ২৪), কারণ তাঁর রাজত্ব নন্দ বংশের তিনশ বছর পরে ঘটেছিল। দ্বিতীয় মতটি ঐতিহাসিক মহলে অধিকতর মান্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কারণ যে দুটি প্রাকৃত লেখ থেকে খারবেলের কথা জানা যায়, তার কোনওটিকেই পুরালেখবিদ্যার বিচারে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগের পূর্বে নির্দেশ করা যায় না।

মহামেঘবাহন বংশীয় কলিঙ্গাধিপতি খারবেল তাঁর জীবনের প্রথম পনেরো বছরে বালকসুলভ ক্রীড়াদিতে লিপ্ত ছিলেন। তারপরের নয় বছর তাঁর অতিবাহিত হয় যুবরাজ হিসেবে (*নববসানি যোবরজ*)। চব্বিশ বছর সম্পূর্ণ হলে (*সংপুংণং চতুবীসতি বসো*) খারবেল কলিঙ্গের রাজা হলেন। দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে অশ্ব, হস্তী, পদাতিক এবং রথ সমন্বিত এক বিশাল বাহিনী তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁর পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাতকর্ণি রাজাকে কিছুমাত্র ধর্তব্যের মধ্যে না এনে (*দুতিয়ে চ বসে অচিতয়িতা সাতকংনিং পছিম-দিসং হয়-গজ-নর-রধ বহুলং দণ্ডং পঠাপয়তি*)। সেই বাহিনী কৃষ্ণা বা কহ্নবেণা বা বাণগঙ্গা নদী পর্যন্ত গিয়ে অসিকনগরে ত্রাস সঞ্চার করেছিল। অসিক বা ঋষিক নগরের অবস্থান সম্ভবত গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর

Scanned with CamScanner

বর্তী অঞ্চলে। চতুর্থ বছরে খারবেলের পদবন্দনা করেছিল রঠিক-ভোজকরা, এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তাঁরা। এদের অবস্থান বর্তমান নাগপুরের ইতে এলাকায় নির্দেশ করা সম্ভব। অষ্টম বর্ষে তাঁর বিশাল সেনা গোরথগিরি-তে (গয়া জেলার বরাবর পাহাড়) আঘাত হানে, রাজগৃহকেও পীড়িত করে। এর ফলে মিত নামক এক যবনরাজ মথুরায় পলায়ন করেন। এই যবন বা ইন্দো-গ্রিক শাসকের যথার্থ শনাক্তকরণ সম্ভব নয়। এই প্রকার সামরিক সাফল্য ও তজ্জনিত রাজনৈতিক প্রতাপবৃদ্ধির স্মারক হিসেবে সম্ভবত নির্মিত হল এক মহাবিজয় প্রাসাদ, তাঁর নবম রাজ্যবর্ষে। দশম বর্ষে তিনি বিজয় অভিযান পাঠালেন ভরধবস বা ভারতবর্ষে। এই উল্লেখটি চিত্তাকর্ষক, কারণ খারবেল অবশ্যই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর সামরিক সাফল্য লাভ করেন নি। হয় এটি নিছক বাগাড়ম্বর, নতুবা 'ভারতবর্ষ' শব্দটি দ্বারা উপমহাদেশের কোনও নির্দিষ্ট ও বিশেষ এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। এই ভারতবর্ষ মগধ, মথুরা এবং উত্তরাপথ থেকে পৃথক, কারণ খারবেল নিজেই উক্ত এলাকাগুলিকে হাতিগুম্ফা *প্রশস্তিতে* আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে ভরধবস বা ভারতবর্ষ সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকার এক অংশ, যার অবস্থান বোধহয় মগধ ও মথুরার অন্তর্বর্তী কোনও এলাকায়। ওই একই বছরে প্রাক্তন কোনও রাজার দ্বারা নিবেশয়িত পীথুণ্ড নামক এলাকায় তিনি গর্দভ দিয়ে হলচালনা করিয়েছিলেন (*পীথুংডং গদভ-নংগলেন কসয়তি*)। পীথুণ্ড সম্ভবত অন্ধ্র দেশের উপকূলবর্তী এলাকা। বর্ণনাটির মধ্যে বিধ্বস্ত এলাকাটির প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্য প্রকটিত হয়েছে; নিতান্ত হেলায় যে খারবেল এই ধ্বংসসাধন করেছিলেন তা বোঝাতেই এমন বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি সম্ভবত ত্রমির বা দ্রমিড় বা তামিল এলাকার কোনও শক্তিসংঘকে পর্যুদস্ত করেন (*ত্রমির-দহ সংঘাতং*)। মনে হয়, অন্ধ্র উপকূল ধরে তিনি আরও দক্ষিণে তামিল এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং সেখানেও তামিল গোষ্ঠীগুলির সম্মিলিত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সফল হন। দ্বাদশ বছরে তাঁকে আবার দেখা যাবে উত্তরাপথে (বা উত্তর ভারত) অভিযান করতে, যখন মগধরাজ বহসতিমিত্র (বৃহৎস্বাতীমিত্র?) তার পাদবন্দনা করলেন, মগধদেশীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হলেন এবং তিনি অঙ্গ মগধ থেকে বহু ধনসম্পত্তি (লুণ্ঠনের দ্বারা?) নিয়ে এলেন (*অঙ্গ-মগধং বসুং চ নয়তি*)। সুদূর দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্যরাজের কাছ থেকেও শতসহস্র মণি-মুক্তা রত্নাদি আনালেন (*পংগুরাজা...মুতমনি-রতনানি আহরাপয়তি ইধ সত সহসানি*)। এই বর্ণনায় প্রথাগত অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক। মাদুরা সন্নিহিত পাণ্ড্য এলাকার উপর কলিঙ্গের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সামান্যই। হাতিগুম্ফা লেখতে তাঁকে জৈন ধর্মে অনুরক্ত, বহু দানধ্যানে নিরত এবং জনহিতকর প্রকল্পে যুক্ত শাসক বলে দেখানো হয়েছে। তাঁর অগ্রমহিষীও যে জৈনদের উদ্দেশে একটি গুহাবাস নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে উদয়গিরি পর্বতগাত্রে

Scanned with CamScanner

খোদিত একটি শিলালেখতে। প্রশস্তিসুলভ অতিরঞ্জন ও বাগবিস্তারের মধ্যেও যে বাস্তব ছবিটি ফুটে ওঠে, তা হল কলিঙ্গকে খারবেল এক আগ্রাসী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মগধের প্রতি তাঁর বৈরিতাও *প্রশস্তিটিতে* বেশ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত। মগধের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান, বহু ধনরত্ন লুঠ, মগধরাজ বৃহস্বাতীমিত্রের আত্মসমর্পণ—এগুলির মধ্যে দিয়ে কি কলিঙ্গের মাগধ অধিপত্যে থাকার তিক্ত স্মৃতি ও তজ্জনিত প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়? খারবেল পরাক্রান্ত রাজা হলেও মহামেঘবাহন বংশ কলিঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তার একজন বংশধরের কথাই কেবলমাত্র জানা আছে—তিনি কলিঙ্গাধিপতি বক্রদেব। মহামেঘবাহনবংশীয় রাজাদের অস্তিত্ব খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতকের প্রথম দিক পর্যন্তই দেখা যায়।

সমকালীন দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সাতবাহন রাজবংশের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম ভাগে ও সন্নিহিত গুজরাট এলাকায় শক *মহাক্ষত্রপ/ক্ষত্রপদের* উপস্থিতিও লক্ষণীয়। সাতবাহনরাই দাক্ষিণাত্যের প্রথম পরাক্রান্ত রাজশক্তি। তাঁদের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত অনুধাবনের জন্য পুরাণ, লেখমালা, মুদ্রার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। একথা ঠিকই যে লেখমালা থেকে জ্ঞাত সাতবাহন রাজাদের নামের সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত রাজাদের নামের মিল আছে। বিশেষ করে মনে রাখা দরকার পুরাণে এই সব রাজা *অন্ধ্র* বা *অন্ধ্রভৃত্য* বলে অভিহিত; তাঁদের সাতবাহনবংশীয় বলে পুরাণে বলা হয় নি। আবার লেখমালায় অনুরূপ নামধারী শাসকরা কেবলমাত্র সাতবাহনবংশীয় বলেই আখ্যাত, তাঁদের কখনওই লেখতে *অন্ধ্র* বা *অন্ধ্রভৃত্য* বলে পরিচিতি দেওয়া হয় না। এই আপাতবিরোধী তথ্যরাজির মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে যদি স্বীকার করা হয় যে, সাতবাহনরা *অন্ধ্র* বা *অন্ধ্রভৃত্য* নামক জনগোষ্ঠীর একটি শাখাবিশেষ, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন।

পুরাণের বর্ণনা মতে কাণ্ব বংশের পর *অন্ধ্র/অন্ধ্রভৃত্যদের* শাসনের শুরু হয়; প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। সিমুকের নাম লেখ ও মুদ্রাতেও উৎকীর্ণ আছে; ফলে তাঁর ঐতিহাসিকতা নিয়ে সংশয় নেই। সমস্যা হল এই রাজবংশের কালপঞ্জি নির্দ্ধারণ করা ও তাঁদের আদি বাসস্থান তথা ক্ষমতার প্রাথমিক কেন্দ্রটিকে চিহ্নিত করা। বিভিন্ন তথ্যসূত্রের সমাহারে এইটুকু বোঝা যায় যে সাতবাহন/অন্ধ্র রাজাদের রাজত্বকাল আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার সামান্য কিছু পরে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঠিক কাল নির্দ্ধারণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতৈক্য নেই। *বায়ুপুরাণের* বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে সতেরো, আঠারো, কখনও বা উনিশজন রাজার নাম পাওয়া যায়। অথচ বলা হয়েছে ত্রিশজন অন্ধ্র রাজা রাজত্ব করেছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর *বায়ুপুরাণের* পাণ্ডুলিপির পর্যালোচনা করে রায় দিয়েছিলেন যে

Scanned with CamScanner